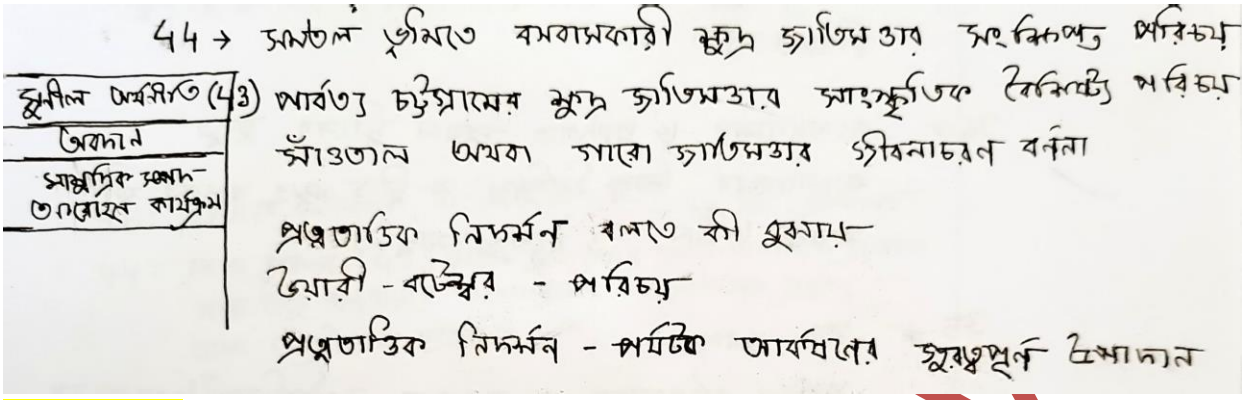


44 BCS, 43 BCS

অধ্যায় ০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

[রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

উপজাতি সম্প্রদায়সমূহঃ

বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে (পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ) আদিকাল থেকে মূলত বাঙালি নৃগোষ্ঠীর বৃহৎ পরিসরে বসবাস বিদ্যমান ছিল। তবে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর উদ্ভবের আগে এই বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এই বাংলা অঞ্চলে আর্যদের আগমনের পূর্বে অনার্য বা আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীগুলো যেমন - নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A7%80

বাংলা অঞ্চলে প্রথম মানবগোষ্ঠী হিসেবে আগমন ঘটেছিল নেগ্রিটোদের। এরপর অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী এসে নেগ্রিটোদের পরাজিত করে এখানে বসতি স্থাপন করে। এক সময় অস্ট্রিকদের সংখ্যাধিক্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে নেগ্রিটোরা ক্রমশ এই অঞ্চল থেকে বিলীন হয়ে যায়। এরপর আগমন ঘটে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর। দ্রাবিড়রা অস্ট্রিকদের

BCS JOURNEY

সাথে লড়াই করে এই বাংলা অঞ্চলে বসতি গড়তে সমর্থ হয়। দ্রাবিড়দের আগমনের পর মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয়দের আগমন ঘটেছিল এই অঞ্চলে। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সাথে শক্তি ও সামর্থ্যে টিকে থাকতে না পেরে মঙ্গোলীয়রা এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে। এরপরেই পুরো ভারতবর্ষসহ এই বাংলা অঞ্চলে আর্যদের আগমন ঘটে। পরবর্তীতে আর্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এসব নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়।

বাংলাদেশের প্রথম উপজাতি হলো এই অস্ট্রালয়েড বা অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীর মানুষেরা। বর্তমানে বাংলাদেশের সাঁওতাল, কোল, ভিল, ভূমিজ, মুন্ডা, বাঁশফোড়, মালপাহাড়ি, পুলিন্দ, শবর ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হলো এই অস্ট্রিক নরগোষ্ঠী। অর্থাৎ এরাই অস্ট্রিক নরগোষ্ঠীভুক্ত এই বাংলা অঞ্চলের প্রাচীনতম উপজাতি।

এছাড়া এই অঞ্চলে অস্ট্রিকদের পরে আসা দ্রাবিড়দের বর্তমানে তেমন কোনো উত্তরপুরুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতে এদের অধিক হারে বসবাস রয়েছে। ভারতের নিকটতম দেশের বিচারে এদের দেখা যায় মূলত শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তানে। তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালায়ালম, ব্রাহুই ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিক পূর্বপুরুষ হলো দ্রাবিড়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়াতে তামিলদের একটি বড় অংশ বসবাস করে। বাংলাদেশের দ্রাবিড়রা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছে। এই বিচারে বিশুদ্ধ দ্রাবিড় বাংলাদেশে ততটা দেখা যায় না। তবে পাহাড়িয়া, ওরাওঁ এই দুইটি জাতিগোষ্ঠী এখনও দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ দ্রাবিড় নৃগোষ্ঠীভুক্ত এই দুটি জাতিগোষ্ঠী এদেশের প্রাচীন উপজাতি হিসেবে বিবেচিত।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জাতি সমূহের তালিকা ও সংখ্যা

BCS JOURNEY

পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে বাংলাদেশে উপজাতিদের সংখ্যা ৫০। এগুলো হচ্ছে:

চাকমা (৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন)

মারমা (২ লক্ষ ২৪ হাজার ২৯৯ জন)

সাঁওতাল (১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৬জন)

ত্রিপুরা (১ লক্ষ ৫৬হাজার ৬২০ জন)

গারো/আ· চিক (৭৬ হাজার ৮৫৪ জন)

ওঁরাও (৮৫ হাজার ৮৫৮জন) আরো অনেক।

১)চাকমা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী দাবীদার জুম্ম জনগোষ্ঠীর অন্যতম চাকমা জনগোষ্ঠী। তিন পার্বত্য জেলাতেই চাকমাদের বসবাস রয়েছে। চাকমারা বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। তবে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় সবচেয়ে অধিক চাকমা বসবাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলায় চাকমাদের মোট জনসংখ্যা ২,৩৯,৪১৭ জন। ঐ সময় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার চাকমা শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছিল বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে- যাদের গণনায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। বাংলাপিডিয়া মতে, আনুমানিক ১৫৫০ খ্রিষ্টব্দের দিকে পর্তুগিজ মানচিত্র প্রণেতা লাভানহা অঙ্কিত বাংলার সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও এ পর্যন্ত অস্তিত্বশীল মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই চাকমাদের সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। কর্ণফুলীর নদীর তীর বরাবর চাকমাদের বসতি ছিল। চাকমাদের আরো আগের ইতিহাস সম্পর্কে

BCS JOURNEY

দুটি তাত্ত্বিক অভিমত প্রচলিত। উভয় অভিমতে মনে করা হয়, চাকমারা বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান আবাসভূমিতে বসতি স্থাপন করে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাত্ত্বিক অভিমত অনুযায়ী, চাকমারা মূলত ছিল মধ্য মায়ানমারের আরাকান এলাকার অধিবাসী। তবে বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা পুস্তকের মতে, কিংবদন্তী অনুযায়ী অতীতে চাকমারা চম্পকনগর নামে একটি রাজ্যে বাস করত। চম্পক নগর ত্রিপুরা রাজ্যেরই কাছাকাছি কোন জায়গায় অবস্থিত ছিল। এ ব্যাপারে নানা সাক্ষ্যও পাওয়া যায়। অশোক কুমার দেওয়ানের অনুমানে উত্তর ত্রিপুরার কোন স্থানে বসবাসকারী চাকমারা সেখানে আনুমানিক দুশ থেকে আড়াইশ বছর কাল অতিবাহিত করার পর পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর ত্রিপুরা থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বদিকে সরে আসতে থাকে এবং পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলী এবং তার উপনদীসমূহের উপত্যকা ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই হিসাব অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের আগমন ৫০০ বছরের বেশি নয়। চাকমা রাজবংশের ইতিহাস অনুযায়ী বিজয়গিরিকে ১ম রাজা ধরলে ৩২/৩৩ তম রাজা হচ্ছেন অরুণযুগ (ইয়াংজ )। তার শাসনকাল আনুমানিক ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দ। চাকমা ঐতিহাসিকদের মতে অরুণ যুগের পতনের পরপরই অর্থাৎ ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দে চাকমারা বার্মা থেকে চট্টগ্রামে বা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করেন।

https://nrigostisanad.gov.bd/nrri-goshthi

২) ত্রিপুরা:

বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে। তিন পার্বত্য জেলা ছাড়াও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমতল এলাকার কুমিল্লা, সিলেট, বৃহত্তর চট্টগামের বিভিন্ন উপজেলা, রাজবাড়ি, চাঁদপুর, ফরিদপুর ইত্যাদি অঞ্চলেও বর্তমানে বসবাস করে। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে একসময় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী যে সবর্ত্র ছিল ১৮৭২

BCS JOURNEY

ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদন পরীক্ষা করলে তার প্রমাণ মেলে। ১৮৭২ সালে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা ছিল ১৫,৬৩২ জন যা ১৮৮১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৮,৫০৯ জনে। বর্তমানে বাংলাদেশে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা অনেকেই মনে করেন দুই লক্ষের কাছাকাছি। তার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা দেড় লক্ষাধিক। বাংলাপিডিয়া মতে, এরা ছিল বর্তমান বারীয় রাজ্য ত্রিপুরার পার্বত্য এলাকার অধিবাসী। পরবর্তীতে এরা নিজ এলাকা ছেড়ে বাংলাদেশের মূলত কুমিল্লা, সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। অনেকের মতে, টিপরারা আসাম, বার্মা এবং থাইল্যাণ্ডের অধিবাসী সাধারণ এক উপজাতির পূর্বপুরুষ বড়ো জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা পুস্তকের মতে, এ জাতির মূল অংশ বাস করছে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়াও ভারতের মিজোরাম , আসাম প্রভৃতি প্রদেশেও অনেক ত্রিপুরা বাস করে। মিয়ানমারেও ত্রিপুরাদের জনবসতি আছে বলে জানা যায়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে জানা যায় আনুমানিক ৬৫ খ্রিস্টাব্দে সুই বংশের সময়কালে পশ্চিম চীনের ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদীর উপত্যাকা হচ্ছে এদের প্রাচীন আবাসস্থল। পরবর্তীতে এই জনগোষ্ঠী ভারতের আসাম হয়ে বর্তমান বসতি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বলে ইতিহাস সূত্রে জানা যায়।

৩) মারমা:

তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে মারমাদের সবচেয়ে বেশি লোক বান্দরবান জেলায় বাস করে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত মারমা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে ১,৪২,৩৩৪ জন। বাংলাপিডিয়া মতে, মারমা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বার্মিজ শব্দ ‘মায়ানমা’ থেকে, যার অর্থ বার্মার অধিবাসী। মারমা জনগণের

BCSJOURNEY

পূর্ব পুরুষগণ বার্মার পেগু নগরে বসবাস করতেন। আরাকান রাজার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মহাপিন্নাগি ১৫৯৯ সালে বার্মায় একটি আগ্রাসন পরিচালনা করেন। তখন তারা বঙ্গীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা পুস্তকের মতে, ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজা শ্রী সুধাম্মার ( শ্রীসুধর্ম ) মৃত্যুর পর তার এক অমাত্য নরপতি আরাকানের সিংহাসন দখল করে রাজপরিবারের সদস্য ও পণ্ডিতদেরকে মৃতুদণ্ড দিতে থাকলে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাতে থাকে। দেশের এই রাজনৈতিক দুর্যোগের সময় রাজার পুত্র নাগাথোয়াইখিন রাজপরিবারের সদস্যবর্গ ও পণ্ডিতদের নিয়ে রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে যান। এসময় তিনি চট্টগ্রামের কাইসাঁ জায়গায় আশ্রয় নেন। প্রায় ৫০০০০ সৈন্য তাকে অনুসরন করে। কাইসাঁ বা কর্ণফুলী নদীর তীরে বাস করতে থাকে। নাগাথোয়াইখিন কাইঁসা অঞ্চলের শাসক হিসেবে বা ম্রাইমাগ্রি মাঙঃ বা ম্রাইমাগ্রিদের রাজা হিসেবে পরিচিতি পান। আরাকানের নতুন রাজা নাগাথোয়াইখিন এর অবস্থান জানার পর শত্রুতার পথে না গিয়ে তাকে কাইসাঁ অঞ্চলের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেন।১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা থেকে আরাকানি শাসনের পতন হলে মোগল শাসণাধীনে মারমাদের পেলেংসা: গোত্র মোগলদের কর প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের স্থায়ী আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল। ১৭৮২ সালের দিকে তারা পেলেংসা: রাজবংশের পূর্বসূরী ম্রাচাই ধাবইং এর নেতৃত্বে সীতাকুন্ড এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ধাবইং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে কার্পাস মহলের কর আদায়ের চুক্তি অনুসারে ঐ এলাকার চিফ পদ লাভ করেন।

৪) মণিপুরী :

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের শিকার হয়ে এবং যুদ্ধজনিত কারণে ভারতের

BCS JOURNEY

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীরা দেশত্যাগ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলায়, ত্রিপুরা রাজ্যে এবং বাংলাদেশে ব্যাপক সংখ্যক মণিপুরী অভিবাসন ঘটে। বার্মা-মণিপুর যুদ্ধের সময় (১৮১৯-১৮২৫) তৎকালীন মণিপুরের রাজা চৌরজিৎ সিংহ, তার দুই ভাই মারজিৎ সিংহ ও গম্ভীর সিংহসহ সিলেটে আশ্রয়গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে আশ্রয়প্রার্থীদের অনেকেই স্বদেশে ফিরে যায়, কিন্তু বহু মণিপুরী তাদের নতুন স্থানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। বাংলাদেশে আসা মণিপুরীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা, ময়মনসিংহের দুর্গাপুর, ঢাকার মণিপুরী পাড়া এবং প্রধানত বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বসতি গড়ে তোলে।বর্তমানে সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলায় মণিপুরী জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে ভাষাগত এবং ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশের মণিপুরীরা তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং স্থানীয়ভাবে তারা (১) বিষ্ণুপ্রিয়া, (২) মৈতৈ ও (৩) পাঙন নামে পরিচিত। মণিপুরের অধিবাসীদের মধ্যে এই তিনটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের শিকার হয় এবং তারা বাংলাদেশে এসে পাশাপাশি বসতি স্থাপন করে। বিষ্ণুপ্রিয়ারা ককেশয়েড মহাজাতির আর্য-ভারতীয় উপপরিবারের অন্তর্গত এবং তাদের ভাষার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা। মৈতৈরা মঙ্গোলয়েড মহাজাতির তিব্বতী-বর্মী উপ-পরিবারের অন্তর্গত এবং তাদের ভাষার নাম মৈতৈ। পাঙনরা আর্য বংশদ্ভুত হলেও মৈতৈ ভাষায় কথা বলে এবং ধর্মীয়ভাবে তারা মুসলিম। বাংলাদেশের মণিপুরীদের মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এসআইএল ইন্টারন্যাশনালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া জনসংখ্যা ৪০ হাজার এবং মণিপুরী মৈতৈ জনসংখ্যা ১৫ হাজার। ভাষাগত ভিন্নতা বাদ দিলে বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈদের মধ্যে সামাজিক,

BCS JOURNEY

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তেমন পার্থক্য নেই। মণিপুরীদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী। মণিপুরী সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম দিক হলো মণিপুরী নৃত্য যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। মণিপুরীদের মধ্যে ঋতুভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান বেশি। বছরের শুরুতে হয় মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়াদের বিষু এবং মৈতৈদের চৈরাউবা উৎসব। আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও কাঙ উৎসবের সময় প্রতিরাত্রে মণিপুরী উপাসনালয় ও মন্ডপগুলোতে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাচ ও গানের তালে পরিবেশন করা হয়। কার্ত্তিক মাসে মাসব্যাপী চলে ধর্মীয় নানান গ্রন্থের পঠন-শ্রবন। এরপর আসে মণিপুরীদের বৃহত্ম উৎসব রাসপূর্ণিমা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের রাজা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র প্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলানুকরন বা রাসপুর্ণিমা নামের মণিপুরীদের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে প্রায় দেড়শত বছর ধরে (আনুমানিক ১৮৪৩ খ্রী: থেকে) পালিত হয়ে আসছে। কার্ত্তিকের পুর্ণিমা তিথিতে দুরদুরান্তের ল ল ভক্ত-দর্শক মৌলবীবাজার জেলার সিলেটের কমলগঞ্জের মাধবপুর জোড়ামন্ডবের এই বিশাল ও বর্ণাঢ্য উৎসবের আকর্ষনে ছুটে আসেন। বসন্তে দোলপূর্ণিমায় মণিপুরীরা আবির উৎসবে মেতে উঠে। এসময় পালাকীর্ত্তনের জনপ্রিয় ধারা "হোলি" পরিবেশনের মাধ্যমে মণিপুরী তরুণ তরুণীরা ঘরে ঘরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এছাড়া খরার সময় বৃষ্টি কামনা করে মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়ারা তাদের ঐতিহ্যবাহী বৃষ্টি ডাকার গান পরিবেশন করে থাকে।

৫) সাওতাল :

সাঁওতাল বা মান্দি পূর্বভারত ও বাংলাদেশের সবচেয়েবড় আদিবাসী নৃগোষ্ঠীগুলির একটি। এরা নিজেদেরকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ রচিত মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের প্রত্যাখ্যিত-ভাব শিষ্য একলব্যের বংশধর বলে বিশ্বাস করে এবং তীরচালনাকালে এখনও নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যবহার করে না কারণ তাদের আদিপুরুষ

BCS JOURNEY

একলব্যকে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল দান করেছিলেন। সান্তাল , সান্তালি , হোর , হর , সাঙতাল , সান্দাল , সন্থাল , সান্থাল , সান্তালি , সাতার প্রভৃতি অভিধায়ও এ নৃগোষ্ঠী অভিহিত হয়ে থাকে।

৬) গারো :

গারো ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড় ও বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়। ভারতে মেঘালয় ছাড়াও আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও কারবি আংলং জেলায় এবং বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ছাড়াও টাঙ্গাইল, সিলেট, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঢাকাও গাজীপুরজেলায় গারোরা বাস করে। গারোরা ভাষা অনুযায়ী বোডো মঙ্গোলীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক গারোই নিজেদেরকে মান্দি বলে পরিচয় দেন। গারোদের ভাষায় 'মান্দি' শব্দের অর্থ হল 'মানুষ'।[২] গারোদের সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত। তাদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'; যাতে দেবতা মিসি আর সালজং এর উদ্দেশ্যে উৎপাদিত ফসল উৎসর্গ করা হয়। উল্লেখ্য ওয়ানগালা না হওয়া পর্যন্ত মান্দিরা নতুন উৎপাদিত ফসলাদি খেত না। আশ্বিন মাসে একেক গ্রামের মানুষদের সামর্থ্যানুযায়ী সাত দিন কিংবা তিনদিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। অতীতে গারোরা সবাই তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করত। তাদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'। ১৮৬২ সালে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে বর্তমানে ৯৮ ভাগ গারোরাই খ্রীষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তাদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠানে বেশ পরিবর্তন এসেছে। গারোদের প্রধান দেবতার নাম তাতারা রাবুগা। এছাড়াও অন্যান্য দেবতারা হলেন- মিসি সালজং, সুসমি, গয়ড়া প্রমুখ। বিভিন্ন গবেষকগণ বিভিন্ন সময়ে গবেষণা করে এ পর্যন্ত বেশ

BCS JOURNEY

কয়েকটি গারো বর্ণমালা আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো উচ্চ গবেষণার জন্য বিরিশিরি কালচারাল একাডেমি-তে সংরক্ষণ করা আছে। বাংলাদেশি গারোরা হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল,শূকর প্রভৃতি খায়। মদ তাদের অপরিহার্য পানীয়। বর্তমানে গারোরা লেখাপড়া ও চাকুরি করার সুবাদে বিভিন্ন স্থানে গমন এবং দেশীয় লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠাই দেশীয় খাবারগুলো নিজস্ব সংস্কৃতির পাশাপাশি খাবার খেতে ভালোবাসে। গারোদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে-নাখাম কারি। যা পুটি মাছের শুটকি দিয়ে তৈরি হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুকুরের মাংস গারোদের অতি প্রিয়। বাংলাদেশে বসবাসকৃত বর্তমান গারোদের ৯০% ধর্মান্তরিত খিষ্ট্রান। প্রায় ২% মুসলিম ও হিন্দু এবং বাকি ১০% ঐতিহ্যবাহী ধর্ম পালন করে(২০০৮ সালের তথ্যমতে)। গারোদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নাম সংসারেক। এর অর্থ কেউ জানে না। তবে গবেষকদের মতে সম্ভবত বাংলা সংসার থেকে সংসারেক শব্দটি এসেছে। গারোরা হিন্দু ধর্মালম্বীদের মত পূজা করে থাকে। তাদের প্রধান পূজা 'ওয়ানগালা' । সালজং(Saljong) তাদের উর্বরতার দেবতা এবং সূর্য সালজং এর প্রতিনিধি। ফসলের ভালোমন্দ এই দেবতার উপর নির্ভর করে বলে তাদের বিশ্বাস। সুসাইম(Susime) ধন দৌলতের দেবী এবং চন্দ্র এই দেবীর প্রতিনিধি। গোয়েরা(Goera) গারোদের শক্তি দেবতার নাম। কালকেম(Kal Kame) জীবন নিয়ন্ত্রণ করে বলে গারোদের বিশ্বাস।

৭) ওরাঁও :

ওরাওঁ আদিবাসীরা নৃতাত্ত্বিক বিচারে আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো-অস্ট্রেলীয়) জনগোষ্ঠীর উত্তর পুরূষ। নৃতত্ত্ববিদগণের মতে একই অঞ্চলের মুণ্ডা, মালপাহাড়ি ও সাঁওতালদের সঙ্গে ওরাওঁদের ঘনিষ্ঠ জনতাত্ত্বিক সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সোসাইটির মতানুসারে কুরুখ জাতি বা ওঁরাওদের আদিবাস ছিলো কঙ্কন অঞ্চলে যেখান থেকে

BCS JOURNEY

তারা অভিবাসিত হয়ে উত্তর ভারতে চলে আসে। কঙ্কনি ভাষার সাথে কুরুখ ভাষার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলা ওরাওঁদের প্রধান বসতিস্থল। তবে ১৮৮১ সালের লোকগণনায় দেখা যায় যে, উত্তরবঙ্গ ছাড়াও তখন ময়মনসিংহ, চল্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় কিছুসংখ্যক ওরাওঁ আদিবাসীর বসতি ছিল। অনেক আদিবাসী জাতির মতো ওরাওঁ সমাজও সর্বপ্রাণবাদী প্রকৃতি উপাসক। তবে তাদের ধর্মবিশ্বাসে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সর্বশক্তিমান 'ধরমেশ' স্বীকৃত। এই সর্বশক্তিমানের অবস্থান সূর্যে। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিকাংশই সূর্যকে ঘিরে উদযাপিত হয়। এছাড়া ওরাওঁ সমাজ নানা দেবতায় বিশ্বাসী। ঐসব দেবতার প্রতীকী অবস্থান গ্রাম, কৃষিসমপদ, অরণ্য, মহামারী ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে। এদের তুষ্টির জন্য রয়েছে ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। কোন কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে হিন্দুদের পূজার মিল পাওয়া যায়, যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের 'ভাদু' উৎসবের সঙ্গে ওরাওঁদের 'করম' উৎসবের মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কদম শাখাকে ঘিরে অনুষ্ঠিত এ উৎসবটি বৃক্ষপূজার নামান্তর।

৮) রাখাইন :

রাখাইন বাংলাদেশ ও মায়ানমারের একটি জনগোষ্ঠীর নাম। এরা মগ নামেও পরিচিত। আঠারো শতকের শেষে এরা আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে বসতি স্থাপন করে। বর্তমানে রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস মূলত কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায়। এ ছাড়া রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু রখাইন বসতি দেখা যায়। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলায়ও রাখাইন সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে। রাখাইন শব্দটির উৎস পলি ভাষা। প্রথমে একে বলা হত রক্ষাইন যার অর্থ রক্ষণশীল জাতি। রাখাইন জাতির

BCS JOURNEY

আবির্ভাব হয় খৃষ্টপূর্ব ৩৩১৫ বছর আগে।[২] ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে, ১৭৮৪ সালে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইনদের আগমন ঘটে। মূলত সেসময় বার্মিজ রাজা 'বোদোপ্রা' আরাকান রাজ্য জয় করে। তার জয়লাভে ভয় পেয়ে বিপুল সংখ্যক রাখাইন সমপ্রদায়ের লোক পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। আরাকানের মেঘবতির সান্ধ্যে জেলা থেকে দেড়শ রাখাইন পরিবার বাঁচার আশায় পঞ্চাশটি নৌকাযোগে অজানার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেয়। কয়েকদিন পর তারা কূলের সন্ধান পায় পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী দ্বীপে। এই দ্বীপে তারা বসতি স্থাপন করে এবং তাদের সঙ্গে করে আনা ধান ও ফল-মূলের বীজ বপন করে সেখানে জমি আবাদ শুরু করে। রাখাইনদের বিভিন্ন দলের নেতৃত্বদানকারী প্রধানগণ ছিলেন ক্যাপ্টেন প্যোঅং, উঃগোম্বাগ্রী ও অক্যো চৌধুরী। কয়েকবছর পর বেশি ফসলের আশায় তারা রাঙ্গাবালী ছেড়ে চলে যান মৌডুবিতে। লোকসংখ্যা বাড়লে তারা ছড়িয়ে পড়ে বড়বাইশদিয়া, ছোটবাইশদিয়া, কুয়াকাটা, টিয়াখালী, বালিয়াতলী, বগীসহ বিভিন্ন দ্বীপ এলাকায়।ক্রমাগত তারা বিলুপ্ত হচ্ছে। বলা যায় বাংলাদেশের উপড়ে বর্নিত এলাকা থেকে তার বিলুপ্ত জাতি। গুটি কয়েকটি পরিবার আছে। অন্যরা বর্তমান মায়ানমার দেশে চলে যাচ্ছে বা গেছে।

৯) খাসিয়া :

বাংলাদেশের সিলেট জেলা ও ভারতের আসামে এই জনগোষ্ঠী বাস করে। সিলেটের খাসিয়ারা সিনতেং (Synteng) গোত্রভুক্ত জাতি। তারা কৃষিজীবী। ভাত ও মাছ তাদের প্রধান খাদ্য। তারা মাতৃপ্রধান পরিবারে বসবাস করে। তাদের মধ্যে কাচা সুপারি ও পান খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি। খাসিয়াদের উৎপাদিত পান বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয়। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও এ সম্প্রদায়ের লোকজন শান্তিপ্রিয়। তাদের রয়েছে নিজস্ব

BCS JOURNEY

নিয়ম-কানুন। তবে তাদের মধ্যে খাসিয়ারাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো পুরুষ সম্পত্তির মালিক হয় না। পুরুষদের বিয়ে হলে তারা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠে। তারাও এ অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসীর মতো একটি প্রাচীন সম্প্রদায় হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে আসছে। পাহাড়ের পাদদেশে বিভিন্ন টিলা এলাকায় তাদের বসবাস। দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করলেও তারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। তাহিরপুর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার ও সদর উপজেলার সীমান্ত এলাকায় তারা বসবাস করছে। সুনামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২৫০টি খাসিয়া পরিবার বসবাস করছে। জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যরা এ দেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলে তারা আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এ আদিবাসীরাই অনার্য বলে পরিচিতি লাভ করে। আর্য-অনার্য যুদ্ধে অনার্যরা পরাজিত হয়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। পরে এ গহিন বনেই তারা বসবাস শুরু করে। ফলে তারা শিক্ষা দীক্ষা ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকে। খাসিয়াদের সাংস্কৃতিক জীবন বেশ সমৃদ্ধ। তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো খুব আকর্ষণীয়। তাদের ভাষায় রচিত গানগুলোও হৃদয়ছোয়া।

BCS JOURNEY

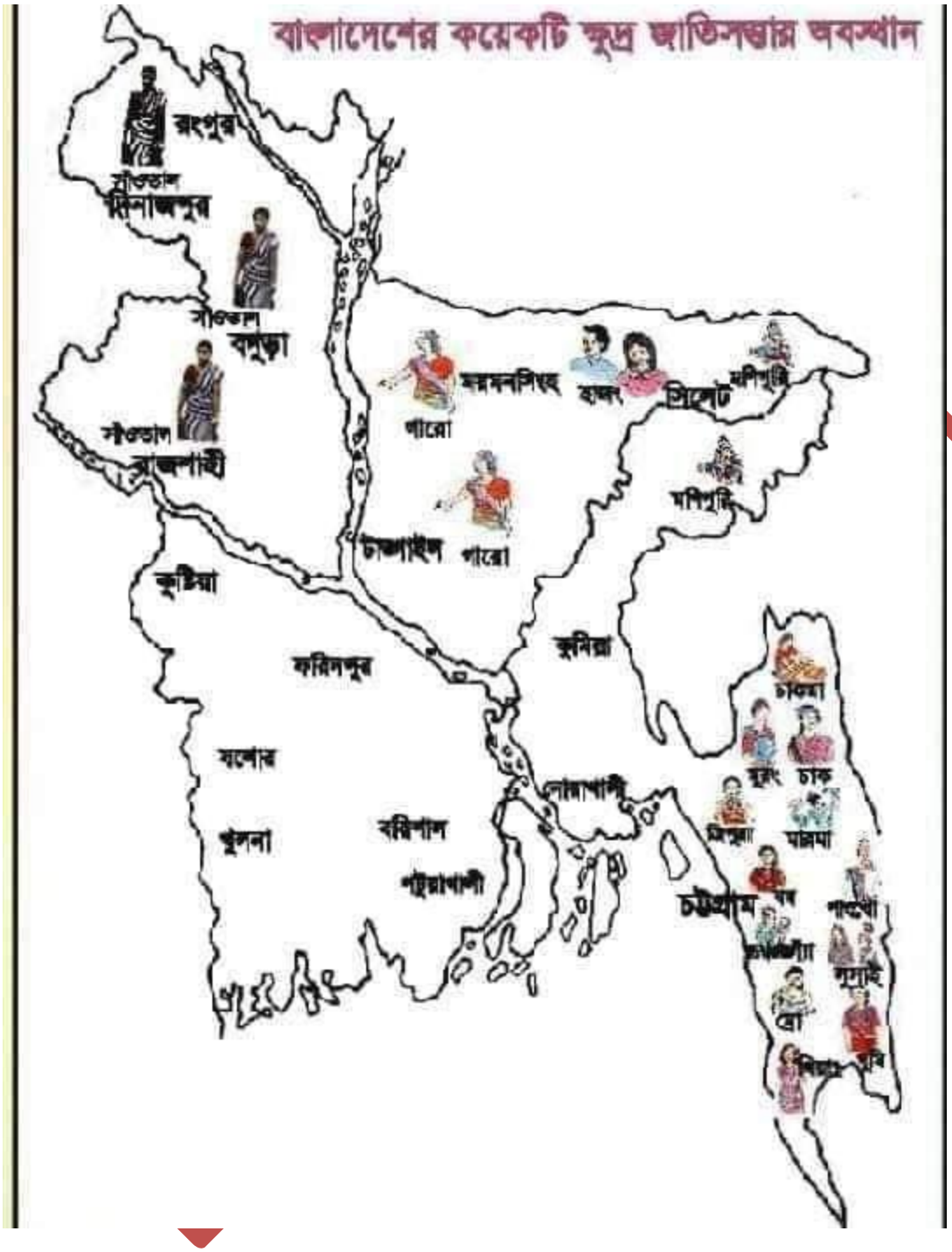

বাংলাদেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অবস্থান
রংপুর
সাঁওতাল
দিনাজপুর
সাঁওতাল
বগুড়া
সাঁওতাল
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
গারো
হাজং
সিলেট
মণিপুরি
মণিপুরি
টাঙ্গাইল
গারো
কুষ্টিয়া
কুমিল্লা
ফরিদপুর
চাকমা
মুরং
চাক
যশোর
নোয়াখালী
ত্রিপুরা
মারমা
খুলনা
বরিশাল
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
পাংখো
লুসাই
ব্রো
বম